প্রাদেশিক সাহিত্য ও তার অনুবাদ

জ্যোর্তিময় দাশ

ভারতীয় সংবিধানে অষ্টম তফশিল -এ যে কয়েকটি ভাষার উল্লেখ আছে সে সব ভারতীয় ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে আমরা ভারতবাসীরা একই দেশের নাগরিক হলেও অনেকেই তাদের ব্যাপারে কিছুই জানি না। জানি না কারণ জানার ইচ্ছে নেই বলে নয়, উপায় নেই বলে---কারণ সেই প্রাদেশিক ভাষাগুলি আমাদের অজানা বলে। সংবিধানের সেই স্বীকৃত ভাষাগুলি ছাড়াও ভারতে অন্যআরও বহু উল্লেখযোগ্য ধনী ভাষা প্রচলিত আছে, যেমন ভোজপুরী, কোঙ্কনী মৈথিলী প্রভৃতি --- আর সেসব ভাষাতেও অত্যন্ত বলিষ্ঠ সবসাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু তাও সেই ভাষাভাষী ছাড়া অন্য উন্নতিশীল দেশগুলিতে নেই -- যেমন ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফরাসী, জার্মানী,জাপানে হয়ত কথ্য ভাষার কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু তফাৎ থাকলেও পঠন - পাঠনের-সাহিত্যের ভাষা একটিই। সে কারণে আমেরিকার পূর্বাঞ্চলের এক প্রত্যন্ত প্রান্তে চাষীর ঘরে বসে এক কৃষকের বউ একটি কবিতা - গল্প লিখলে চার হাজার মাইল দূরে পশ্চিম- সীমান্তে হলিউডের সাহিত্যমনস্কা কোন মক্ষীরাণী নায়িকা সেটা পড়ে তারিফ করতে পারে, চাষী বউয়ের ভাব - ভাবনার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে। অথচ আমি পশ্চিমবঙ্গের দিঘায় বসে সামান্য ৩/৪ মাইল দূরে উড়িষ্যার বাল্মেরে প্রতিবেশী সা হিত্যিক কী লিখছেন সেটা জানতে / পড়তে পারিনা অনেক সময়েই।

অথচ ভারতীয় হিসেবে ‘একজাতি একপ্রাণ’ হতে হলে, জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে কিংবা সাংস্কৃতিক ব্যবধান কম করতে হলে আমাদের এক প্রদেশের মানুষকে অন্য প্রদেশের মানুষজনকে জানতে চিনতে হবে, তার আচার - অনুষ্ঠান, রীতি - নীতি, সামাজিকতা - সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে। আর সেটা করার একটা সহজতম উপ ায় হল, সেই প্রদেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। তার জন্য সেই অন্যপ্রদেশের সাহিত্যকৃতিটির আমার ভাষায় অনুদিত হওয়া দরকার। এখন কথা হল, এই অনুবাদ করানোর দায়িত্ব কে নেবে---অনুবাদ কে করবে---অনুবাদ করা হলে সেটি প্রকাশ করবে কে? বাণিজ্যিক প্রকাশকরা অনুবাদের ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করে না, অনুবাদ বই আদৌ বিক্রি হবে কিনা তার আগাম হাল - হাকিকত না জেনে অনুবাদ - গ্রন্থ প্রকাশের ঝুঁকি নেয় না। জাতীয় সংহতির পথে, ভাবের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে আদান - প্রদানের ক্ষেত্রে এগুলো একটা বড় সমস্যা তো বটেই।

এহেন সমস্যার প্রেক্ষিতেই তৈরি হয়েছিল পাঁচদশক আগে ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া (এনবিটি) নামে এক সরকারি সংস্থা যাদের মূল উদ্দেশ্য হল ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার উৎকৃষ্ট সাহিত্যকৃতিগুলিকে অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষ ায় অনুবাদের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা, প্রকাশ করা এবং প্রকাশ করার পর তার সর্বভারতীয় বিপণনের আয়োজন করা। অর্থ াৎ বাংলায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ নামক কালজয়ী উপন্যাসটি আজ এনবিটি-র কর্মোদ্যমের সুবাদে হিন্দি, মারাঠী, তামিল, তেলেগু কন্নড়, মালায়লম, ওড়িয়া প্রভৃতি ভারতের সবকটি সংবিধান স্বীকৃত ভাষায় অনুদিত হয়ে সেসব ভাষাভাষী সাহিত্যপ্রেমী সাধারণ মানুষ, গবেষক, ভাষাবিদ, সাহিত্যিক সকলশ্রেণীর পাঠকের ক াছে পৌঁছে গেল। এভাবেই তারা পরিচিত হতে থাকল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’, বনফুল, তারাশঙ্কর, অ াশাপূর্ণা, মহাশ্বেতা, সুনীল, শ্যামল, শীর্ষেন্দুর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃজনের সঙ্গে। ওদিকে আমরাও গুজরাতের জ্ঞ ানপীঠ পুরস্কার পাওয়া কথাসাহিত্যিক পান্নালাল পটেলের এপিক উপন্যাস ‘মানবিনী ভবাই’ বাংলা অনুবাদে পড়তে পেরে জানতে পারলাম সে দেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামের কৃষকদের মর্মস্পর্শী জীবন - যাপন কাহিনী। এনবিটি-র এই অনুবাদ প্রকল্পটি নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য এবং বিগত পাঁচ দশকে তারা প্রাদেশিক সাহিত্যের এক বিপুল সম্ভার ইতিমধ্যে অনুবাদ করেছে।

এমন একটি বৃহৎ কর্মযজ্ঞ কীভাবে সম্পাদিত হচ্ছে এবং মূলগ্রন্থের অনুবাদটি কী বহিরঙ্গে ভারতের অন্য ১৭/১৮ টি প্র

াদেশিক ভাষায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং অন্য ভাষাগুলিতে অনুবাদের মান কেমন হচ্ছে এবং আমরা অনুবাদের মাধ্যমে মূল বইটির সাহিত্যশৈলী সঠিকভাবে পাচ্ছি কিনা সেটা বিচক্ষণ পাঠকের জানবার বাসনা হতেই পারে। তাদের সকলের অবগতির জন্য জানাই এনবিটি-র ভাষান্তরের এই প্রকল্পটির নাম 'আদান-প্রদান'। বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটির সুপারিশে একটি প্রাদেশিক ভাষার বই আদান - প্রদান বিভাগের জন্য নির্বাচিত হল --- বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে তেমন বড়ো ধরণের কোন ত্রুটি থাকে না --- যদিও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য সকল লেখকের বই নির্বাচিত না হলেও এবং বহু বিশিষ্ট লেখকেরা নির্বাচিত হওয়া থেকে বাদ পড়লেও, যেসব লেখকের যেসব বইগুলি নির্বাচিত হয়, সেই লেখকেরা এবং তাদের গ্রন্থগুলি সে ভাষায় মোটামুটিভাবে প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে থাকে বলে তেমন আপত্তির কিছু নেই। এপর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিক থাকলেও অনুবাদের ব্যাপারে এনবিটি এক বিচিত্র পদ্ধতি অবলম্বন করে। সেটি হল - মূল ভাষ ার বইটিকে প্রথমেই হিন্দি ভাষায় অনুবাদ করা হয়, তারপর সেই হিন্দি অনুবাদ থেকে অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় অনুব াদ করা হয়। অর্থাৎ পান্নালাল পটেলের ওপরে উল্লেখিত গুজরাতি 'মানবিনী ভবাই' বইটি সরাসরি গুজরাতি থেকে ব াংলা অনুদিত না হয়ে প্রথমে হিন্দিতেঅনুবাদ করা হল 'জীবন এক নাটক' নামে, তারপরে ওই হিন্দি অনুবাদ থেকে ব াংলা ভাষান্তরিত হল 'এই জীবনের রঙ্গমঞ্চে' নামে। তেমনই প্রখ্যাত তামিল ঔপন্যাসিক নীল পদ্মনাভনের 'পল্লিকে াল্ডপুরকম' একটি সাড়া জাগানো উপন্যাস --- সেটি হিন্দিতে অনুদিত হল 'যাত্রা কী অন্ত' নামে, তারপরে ঐ হিন্দিটিকে মূল হিসেবে বিবেচ্য করে তা থেকে বাংলা করা হল 'যাত্রিক' নামে, এবং ওই হিন্দি থেকেই অসমীয়া, উর্দু, পাঞ্জাবী প্রভৃতি সব ভাষাতেই অনুদিত হতে থাকে আদত তামিল গ্রন্থটি।

বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার গ্রন্থ মূল থেকে সরাসরি অন্যভাষায় অনুবাদ না করে, অনুবাদের জন্য এনবিটি কেন এমন বিচিত্র একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে তার সপক্ষে এনবিটি-র প্রশাসনিক বা অর্থনৈতিক যুক্তি থাকতে পারে---এবং সেটা যতই জোরালো হোক নাকেন, অনুবাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি সঠিক কিনা সেটা আলোচনা করা প্রয়োজন। ইতালি ভ াষায় একটি প্রবাদ আছে যে 'অনুবাদকমাত্রেই প্রতারক' --- অর্থাৎ অনুবাদক যতই সৎ থাকার চেষ্টা কণ না কেন, তিনি মূল গ্রন্থের যথাযথ আক্ষরিক অনুবাদ করেন না বা করার চেষ্টা করেন না। কেননা প্রতি ভাষার নিজস্ব বুৎপত্তি, নিগূঢ় তাৎপর্য বা বিশিষ্ট ব্যবহারবিধি থাকতে পারে যার সঠিক ভাষান্তর করা সম্ভব হয় না, করলে সেটি অনূদিত ভাষায় সঠিক অর্থ বহন নাও করতে পারে। সেক্ষেত্রে অনুবাদককে নিপায় হয়ে কিছুটা স্বাধীনতা নিতেই হয় অনুবাদটিকে সুখপ াঠ্য করার জন্য। ফলে তিনি আক্ষরিক অর্থের নিরিখে মূল থেকে কিছুটা সরে এসে ভাবানুবাদ করেন,তাহলে দ্বিতীয় অনুবাদটি মূলের থেকে কোথায় গিয়ে যে পৌঁছবে সেটা অনুমান করা দুষ্কর। হয়ত মূল লেখকের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতেও যেতে পারে সেটি। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক

উপরে উল্লেখিত তামিল কথাসাহিত্যিক নীল পদ্মানাভন-এর 'পল্লিকোল্ডপুরম' উপন্যাসটি এনবিটি আদান - প্রদান প্রকল্পে অন্য সব প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদের জন্য নির্বাচন করেছিল ১৯৭০ সালে। পল্লিকোল্ডপুরম কেরালা সমুদ্রুপকূলে এক মন্দির - সমৃদ্ধ শহরের নাম। ঐ শহরটির সমগ্র উপন্যাসে এক সজীব চরিত্রের মতোই গুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে-- তাই লেখক মূল গ্রন্থটির নাম শহরেরনামেই 'পল্লিকাল্ডপুরম' রাখলেন তাৎপর্যপূর্ণভাবে। অনুবাদের সময়ে হিন্দি সংস্করণে তার নাম রাখা হল 'যাত্রা কা অন্ত' -- যার মানে 'যাত্রার শেষ'। লেখক পদ্মনাভন লিখিত উপন্যাসের প্রধান চরিত্রটির (নায়ক বলা যাবে না কারণ নায়ক ঐ শহরটিও হতে পারে) উপন্যাসের শেষে মৃত্যুর ইঙ্গিত আছে। প াঠক লক্ষ্য কণ 'ইঙ্গিত আছে' বলা হল, কেননা 'মৃত্যু যে হলই' এমন স্পষ্ট উল্লেখ নেই। কিন্তু হিন্দি অনুবাদক সেটিকে জীবনযাত্রার শেষ বলে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে উপন্যাসের নাম পাল্টে করলেন 'যাত্রা কা অন্ত।' এটা একান্তভাবে হিন্দি অনুবাদকের নিজস্ব ধ্যানধারণা, যার সঙ্গে মূল লেখকের উপন্যাসের নামকরণের উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল নেই। এবার ব াংলা - অনুবাদক তামিল উপন্যাসটি হিন্দি বইটি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব পেলেন। তিনি বইটির নাম 'য াত্রার শেষ' লিখলে আমাদের হয়ত কিছু বলার থাকত না; তাতে অন্তত হিন্দি অনুবাদকের থেকে নতুন করে কোন ব াড়তি ভুল হত না--- কিন্তু ওই বাঙালি অনুবাদক একটি বাঙময় ও শ্রুতিমধুর শব্দের মোহে 'যাত্রা কা অন্ত' -এর বদলে লিখলেন যাত্রিক। অভিধানে যাত্রিক এর ক্ষেত্রে বলা আছে যে শব্দের ব্যবহার বিশেষণ হলে অর্থ হবে'যাত্রা স ম্পর্কিত, যাত্রাযোগ্য।' আর শব্দের ব্যবহার বিশেষ্য হলে অর্থ - 'যাত্রী, যাত্রাকালের মঙ্গলসূচক জিনিস, পথিক'। এই

সব অর্থের সঙ্গে হিন্দির 'যাত্রা কা শেষ' ভাবনার সঙ্গে কোন সঙ্গতি থাকল না বাংলার 'যাত্রিক'-র; আর মূল উপন্যাসে নামকরনের (পল্লিকোণ্ডপুরম) থেকে পশ্চিমবঙ্গের যে দূরত্ব তার থেকেও বেশি দূরত্ব হয়ে গেল বোধহয়।

এবার বইয়ের কাহিনী - অংশের অনুবাদের ব্যাপারে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় যাবার সময় বিশদ আলোচনার অবকাশ থাকলেও সংক্ষেপে ঐ একই উপন্যাস থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। 'পল্লিকোন্ডপুরম' নামে মূল তামিল উপন্যাসে আছে তেতাল্লিশটি অধ্যায়। হিন্দি অনুবাদেও ভাবার্থজনিত বেশ কিছু ত্রুটি থাকলেও অধ্যায়ের সংখ্যা মূলানুগ তেতাল্লিশটিই আছে। কিন্তু বাংলা তর্জমায় ''তেতাল্লিশতম'' অধ্যায়টি কোন এক দুর্বোধ্য কারণে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে বিয়াল্লিশ অধ্যায়েই বইটিকে শেষ করে দেওয়া হল। কেন এমন কাজ করা হল তার কোন উল্লেখ বইটির কোথাও মুদ্রিত নেই। তবে কী হিন্দি তর্জমার শেষ অধ্যায়ের মৃত্যুর সঙ্গে জীবন যাত্রারশেষের মিল থাকলেও বাংলা 'যাত্রিক' -এর কোন মিল নেই বলে শেষ অধ্যায়টি বাহুল্য হিসেবে বাদ দেওয়া হল ? এ প্রশ্নের উত্তর এনবিটি-র বাংলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক যিনি এই উপন্যাসটি তর্জমার দেখাশোনা করেছিলেন তিনিই বলতে পারেন।

তবে সমান্তরাল ভাবে ভাবা যাক যে এই একই পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি অনুবাদের সময় হিন্দিতেধরা যাক তার নাম দেওয়া হল 'শাদি কী বাদ' (বইয়ের শেষ অধ্যায়ের লাবণ্যের সঙ্গে শোভনলালের বিয়ে হবার ইঙ্গিত আছে, কারণ অমিতকে লেখা লাবণ্যের চিঠির একপাতায় বিয়ের সংবাদ ও অন্য পাতায় কবিতা), আর সেই হিন্দি থেকে পাঞ্জাবীতে অনুবাদের সময়নামকরণ হতেই পারে 'ম্যায় ঝুট বোলা', (কারণ সমগ্র উপন্যাসে লাবণ্য অমিত দুজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে বিবাহ করল না) এবং সে ক্ষেত্রে লাবণ্যের লেখা শেষ অধ্যায়ের কবিতাটি অপ্রয়োজনীয় মনে করে হয়ত বাদই দিয়ে দিল!!

'পল্লিকোন্ডপুরম' -এর বাংলা অনুবাদ (যাত্রিক নীল পদ্মনাভন অনুবাদক - সুবিমল বসাক এনবিটি - ৫৫ টাকা) পড়বার এই অভিজ্ঞতার পর আশঙ্কা হচ্ছে আমরা এ যাবৎ এনবিটির-র অন্য ভাষান্তরিত গ্রন্থগুলি পাঠ করে মূল রচনাটি সম্পর্কে যে ভাবনাচিন্তা এতদিন গঠন করেছিলাম তা সব সঠিক তো? এই সমস্যাটি সমাধানের পথ হিসেবে এনবিটি-র কাছে অনুরোধ থাকল, তার প্রাদেশিক সাহিত্য অনুবাদের বর্তমান এই বিচিত্র পদ্ধটিকে ত্যাগ করে, মূল গ্রন্থটিকে হিন্দি বুড়ি না ছুঁইয়ে এনে সরাসরি অনুবাদের ভাষায় ভাষান্তরিত করার ব্যবস্থা কক। এনবিটির মতো মহীহসদৃশ সরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতি প্রাদেশিক ভাষার উপযুক্ত অনুবাদক খুঁজে পাওয়া আদৌ কোন সমস্যা হওয়া উচিত নয়। দরকার হলে মূল লেখক ও অনুবাদক একত্রে বসে ওয়ার্কশপের মাধ্যমে একাজ করতে পারে। অন্যদেশে অনুবাদের সময় এই ওয়ার্কশপ করার জন্য প্রকাশক দুজনের সব খরচ - খরচা বহন করে এবং অনুবাদটি উচচাঙ্গের হয়।

তা নাহলে শিব গড়তে বসে এনবিটি বাঁদর অথবা আরও নিকৃষ্ট কোন জন্তু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেও পাঠক হিসেবে সকলে তা সমর্থন নাও করতে পারে।